أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 83) www.motaher21.net

لَيَأْكُلُونَ أَمْوٰلَ النَّاسِ بِالْبٰطِلِ

" ভন্ড আলিমদের থেকে সতর্ক থাক।"

" Be careful about false religious leaders."

সুরা: আত-তওবা

আয়াত নং :-৩৪

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ

হে ঈমানদারগণ! এ আহলে কিতাবদের অধিকাংশ আলেম ও দরবেশের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায় পদ্ধতিতে খায় এবং তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে।যারা সোনা রুপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাময় আযাবের সুখবর দাও।

৩৪ নং আয়াতের তাফসীর:

এখানে আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী উম্মাত তথা ইয়াহূদ খ্রিস্টানদের আলিমদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তারা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ খেত আর আল্লাহ তা'আলার সঠিক পথে চলতে মানুষকে বাধা দিত।

সুদ্দী (রাঃ) বলেন: ইয়াহূদী আলিমদের আহবার "أَحْبَارٌ"এবং খ্রিস্টান আবেদদেরকে রুহবান "رَهْبَانٌ" বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ)

"কেন আল্লাহওয়ালাগণ ও আলেমগণ তাদেরকে খারাপ কথা বলতে ও অবৈধ ভক্ষণে নিষেধ করে না? এরা যা করে তা কতই না নিকৃষ্ট!" (সূরা মায়িদাহ ৫:৬৩)

মূলত আয়াতের উদ্দেশ্য হল- যে সকল দরবেশ, সূফী, পীর ও একশ্রেণির আলেম ধর্মের নামে ব্যবসা করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করছে তাদের থেকে সতর্ক করা।

ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের আহবার ও রুহবানগণ যেমন ধর্মের নামে অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ খেত আর মানুষকে নিজের মনগড়া তৈরিকৃত তরীকাহ অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে, তেমনি আমাদের সমাজেও এরূপ ধর্ম ব্যবসায়ী একশ্রেণির আলেম ও পীর-বুজুর্গ রয়েছে যারা পেটপূজারী লম্বা আলখেল্লা পরিধান করে নিজেকে খুব আল্লাহওয়ালা প্রকাশ করত মিথ্যা কথা বলে মানুষের সম্পদ হরণ করে, ধর্মের নামে গুমরাহীর পথ দেখায়। তাদের চক্রান্ত থেকে সাবধান!

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের শাস্তির কথা বলেছেন, যারা নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা সত্বেও যাকাত প্রদান করে না।

যায়েদ বিন ওয়াহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা রাবাযা নামক স্থানে আবূ যার (রাঃ) এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি (তাকে) জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কেন এ ভূমিতে এসেছেন? তিনি বললেন: আমি সিরিয়ায় ছিলাম, তখন আমি (মু'আবিয়া (রাঃ)-কে) এ আয়াত পাঠ করে শোনালাম: "আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং সেটা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।" মুআবিয়া (রাঃ) এ আয়াত শুনে বললেন: এ আয়াত আমাদের ব্যাপারে নাযিল হয়নি বরং আহলে কিতাবের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আমি বললাম যে, এ আয়াত আমাদের ও তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। (সহীহ বুখারী হা: ৪৬৬০) সুতরাং এ আয়াত সকলের জন্য প্রযোজ্য।

যারা সম্পদের যাকাত প্রদান করে না তাদের শাস্তির ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি হল- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন: প্রত্যেক সোনা ও রুপার অধিকারী ব্যক্তি যে তার হক (যাকাত) আদায় করে না, কিয়ামাতের দিন তার ঐ সমুদয় সোনা-রুপাকে পাত তৈরি করে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। যখনই সে পাত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখনই তা পুনরায় গরম করে অনুরূপ দাগ দেয়ার শাস্তি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত দেয়া হবে, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। যতক্ষণ না বান্দাদের মাঝে বিচার ফায়সালা শেষ হয়। অতঃপর সে তার পথ দেখতে পাবে হয় জান্নাতের দিকে না হয় জাহান্নামের দিকে। (সহীহ মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, হা: ৯৮৭)

অর্থাৎ এ জালেমরা শুধু ফতোয়া বিক্রি করে, ঘুষ খেয়ে এবং নজরানা লুটে নিয়েই ক্ষান্ত হয় না। এ সঙ্গে তারা এমন সব ধর্মীয় নিয়ম-কানুন ও রসম-রেওয়াজ উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করে যেগুলোর সাহায্যে লোকেরা তাদের কাছ থেকে নিজেদের পরকালীন মুক্তি কিনে নেয়। তাদের উদর পূর্তি না করলে লোকের জীবন-মরণ বিয়ে-শাদী এবং আনন্দও বিষাদ কোন অবস্থাই অতিবাহিত হতে পারে না। তারা এদেরকে নিজেদের ভাগ্য ভঙ্গা-গড়ার একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। উপরন্তু নিজেরদের এমনসব স্বার্থ উদ্ধারের মতলব তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে গোমরাহীতে লিপ্ত করে রাখে। যখনই কোন সত্যের দাওয়াত সমাজের সংশোধনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসে তখনই সবার আগে এরাই নিজেদের জ্ঞানীসুলভ প্রতারণা ও ধান্দাবাজীর অস্ত্র ব্যবহার করে তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়।

এ আয়াতে মুসলিমদের সম্বোধন করে ইয়াহুদী নাসারা সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ও পাদ্রীদের কুকীর্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা লোকসমাজে গোমরাহী প্রসারের অন্যতম কারণ। ইয়াহুদী-নাসারাদের আলোচনায় মুসলিমদের হয়তো এ উদ্দেশ্যে সম্বোধন করা হয় যে, তাদের অবস্থাও যেন ওদের মত না হয়। আয়াতে ইয়াহুদী-নাসারা সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ও পাদীদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তাদের অধিকাংশই গর্হিত পন্থায় লোকদের মালামাল গলধঃকরণ করে চলছে এবং আল্লাহর সরল পথ থেকে মানুষকে নিবৃত রাখছে। এ বাতিল পন্থা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তারা গীর্জা ও ধর্মের নামে মানুষদের থেকে কর আদায় করত। এতে তারা মানুষদেরকে বোঝাত যে, এগুলো আল্লাহর নৈকট্যের জন্যই গ্রহণ করছে। অথচ তারা এ সম্পদগুলো কুক্ষিগত করত। [কুরতুবী]

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তারা বিচারকার্য ঘুষের উপর করত। [কুরতুবী]

এভাবে তারা পয়সা নিয়ে তওরাতের শিক্ষাবিরোধী ফতোয়া দান করত। আবার কখনো তওরাতের বিধি নিষেধকে গোপন রেখে কিংবা তাতে নানা হীলা বাহানা সৃষ্টি করে নিজেরাই শুধু পথভ্রষ্ট হতোনা বরং সত্যপথ অন্বেষণকারীদের বিভ্রান্ত হওয়ারও কারণ হয়ে দাড়াতো। [সা'দী]

কেননা, যেখানে নেতাদের এ অবস্থা, সেখানে অনুসারীদের সত্য সন্ধানের স্পৃহাও আর বাকী থাকে না। তাছাড়া তাদের বাতিল ফতোয়ার দরুন সরল জনগণ মিথ্যাকেও সত্যরূপে বিশ্বাস করে নেয়। অথবা আল্লাহর দ্বীন বলে এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বোঝানো হয়েছে। [তাবারী]

অর্থাৎ তারা নিজেরা তো পথভ্রষ্ট হয়েছেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান না এনে অর্থলোভে পড়ে আছে। অন্যদেরকেও তেমনি ইসলামে প্রবেশ করা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ থেকে বাঁধা দিচ্ছে। [কুরতুবী]

ইয়াহুদী নাসারা গোষ্ঠীর আলেম সম্প্রদায়ের মিথ্যা ফতোয়া দানের ব্যাধি সৃষ্টি হয় অর্থের লোভ লালসা থেকে। এজন্যে আয়াতে অর্থালপ্সার করুণ পরিণতি ও কঠোর সাজার কথা বর্ণিত হয়। এরশাদ হয়েছেঃ "যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে, তা খরচ করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ দিন"। এখানে 'আর তা খরচ করে না আল্লাহর পথে' বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যারা বিধানমতে আল্লাহর ওয়াস্তে খরচ করে, তাদের পক্ষে তাদের অবশিষ্ট অর্থ সম্পদ ক্ষতিকর নয়। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যে মালামালের যাকাত দেয়া হয়, তা জমা রাখা সঞ্চিত ধন-রত্নের শামিল নয়।' [আবুদাউদ: ১৫৬৪]।

এ থেকে বোঝা যায় যে, যাকাত আদায়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে , তা জমা রাখা গোনাহ নয়।

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, তারপর সে যে সম্পদের যাকাত দিবে না, কিয়ামতের দিন তার সম্পদ তার জন্য চক্ষুর পাশে দুটি কালো দাগবিশিষ্ট বিষাক্ত সাপে পরিণত হবে, তারপর সেটি তার চোয়ালের দু'পাশে আক্রমন করবে এবং বলতে থাকবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার গচ্ছিত ধন। [বুখারী: ১৪০৩]

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি তাঁর উটের যাকাত দিবে না সে যেভাবে দুনিয়াতে ছিল তার থেকে উত্তমভাবে এসে তাকে পা দিয়ে মাড়াতে থাকবে, অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ছাগলের যাকাত দিবে না সে যেভাবে দুনিয়াতে ছিল তার থেকেও উত্তমভাবে এসে তাকে তার খুর ও শিং দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকবে... আর তোমাদের কেউ যেন কিয়ামতের দিন তাঁর কাধে ছাগল নিয়ে উপস্থিত না হয়, যে ছাগল চিৎকার করতে থাকবে, তখন সে বলবে, হে মুহাম্মাদ! আর আমি বলব, আমি তোমার জন্য কোন কিছুরই মালিক নই, আমি তো তোমার কাছে বাণী পৌছিয়েছি। আর তোমাদের কেউ যেন তাঁর কাধে কোন উট নিয়ে উপস্থিত না হয়, যা শব্দ করছে। তখন সে বলবে, হে মুহাম্মাদ! আমি বলব, আমি তোমার জন্য কোন কিছুর মালিক নই, আমি তো তোমাদেরকে পৌছিয়েছি। [বুখারী: ১৪০২; মুসলিম: ৯৮৮]

أَحبَار শব্দটি حِبْر এর বহুবচন। এটা এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে কথাকে খুব সুন্দর করে পেশ করার দক্ষতা রাখে। আর সুন্দর ও নকশাদার পোশাককেও ثَوبٌ مُحَبّر বলা হয়ে থাকে। এখানে উদ্দেশ্য ইয়াহুদী উলামা। رُهبَان শব্দটি رَاهِب এর বহুবচন যার উৎপত্তি رهبنة শব্দ থেকে। এ থেকে উদ্দেশ্য নাসারা উলামা। কারো কারো নিকটে এ থেকে উদ্দেশ্য হল, নাসারাদের সুফীগণ। উলামার জন্য তাদের নিকট বিশেষ শব্দ قسّيسين রয়েছে। এই উভয় শ্রেণীর ধর্মধ্বজীরা এক তো আল্লাহর কালামকে বিকৃত ও পরিবর্তিত করে লোকদেরকে তাদের ইচ্ছা মোতাবেক ফতোয়া ও বিধান দিত এবং এইভাবে তাদেরকে আল্লাহর পথ হতে বাধা প্রদান করত। আর দ্বিতীয়তঃ এই পন্থায় তারা তাদের নিকট হতে অর্থ উপার্জন করত; যা তাদের জন্য হারাম ও বাতিল ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বহু সংখ্যক মুসলিম উমালাদের অবস্থাও ওদের মতই। আর এ হল নবী

(সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার প্রমাণ। যাতে তিনি বলেছিলেন لتتّبعن سنن من كان قبلكم অর্থাৎ, "তোমরা অবশ্যই পূর্ববর্তী উম্মতদের তরীকা অনুসরণ করবে।" (বুখারীঃ ই'তিসাম অধ্যায়)

আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) বলেন যে, এটা যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বের আদেশ। যাকাতের হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পর যাকাত দ্বারা আল্লাহ তাআলা মাল-ধনকে পবিত্র করার মাধ্যম বানিয়েছেন। এই জন্য উলামাগণ বলেন, যে মাল থেকে যাকাত বের করা হবে সে মাল (আয়াতে নিন্দনীয়) 'জমা করে রাখা' মাল নয়। আর যে মাল থেকে যাকাত বের করা হবে না, সে মালই হবে 'জমা করে রাখা' ধনভান্ডার; যার জন্য রয়েছে এই কুরআনী ধমক। সুতরাং সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, "প্রত্যেক সোনা ও চাঁদীর অধিকারী ব্যক্তি যে তার হক (যাকাত) আদায় করে না, যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন তার জন্য ঐ সমুদয় সোনা-চাঁদীকে আগুনে দিয়ে বহু পাত তৈরী করা হবে। অতঃপর সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগা হবে। যখনই সে পাত ঠান্ডা হয়ে যাবে তখনই তা পুনরায় গরম করে অনুরূপ দাগার শাস্তি সেই দিনে চলতেই থাকবে যার পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার পথ দেখতে পাবে; হয় জান্নাতের দিকে না হয় দোযখের দিকে।" (মুসলিম যাকাত অধ্যায়) বলাই বাহুল্য যে, পূর্বোক্ত শ্রেণীর ভ্রষ্ট উলামা ও সূফীদের পরে ভ্রষ্ট ধনবানরাই সাধারণ মানুষদের ভ্রষ্টতার জন্য অধিকাংশে দায়ী। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের মন্দ থেকে হিফাযতে রাখুন। আমীন।

☆ আলোচ্য আয়াতে মুমিনদেরকে সম্বোধন করে ইহুদী ও খ্রীষ্টান পাদ্রী পুরোহিতদের এমন সব কুকীর্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যা লোক সমাজে গোমরাহী প্রসারের অন্যতম কারণ। ইহুদী খ্রীষ্টানদের আলোচনায় মুসলমানদেরকে সম্বোধন করার তাৎপর্য হচ্ছে- মুসলমানদেরকে সতর্ক করা যাতে তাদের অবস্থাও অনুরূপ অধঃপতিত না হয়। এখানে সংক্ষেপে এতটুকু বলা হয়েছে যে তারা অন্যায় পন্থায় মানুষের সম্পদ ভোগ করে। বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারা ঘুষ, হাদিয়া-তোহফার বিনিময়ে ভুল ফতোয়া দেয়, যেটা দিলে লোকজন খুশী হবে সেটাই দেয়, এজন্য তারা ধর্মীয় বিধান ইচ্ছামত পরিবর্তন করে। তাছাড়া তারা এমন সব রীতি-নীতি ও আইন কানুন উদ্ভাবন করে যার ফলে লোকজন নিজেদের পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে তাদেরকে অঢেল অর্থ সম্পদ দিতে বাধ্য হয়। তাদের হীন স্বার্থের বশবর্তী হয়ে দুনিয়ার মানুষকে নিজেদের গোমরাহীর দুঃচ্ছেদ্য জালে বন্ধী করে এমনকি যখন সমাজ সংশোধন ও সত্যিকার ধর্মীয় বিধান কায়েমের কোন চেষ্টা শুরু হয় তখন তারাই সর্ব প্রথম নিজেদের পান্ডিত্যপূর্ণ ধোঁকাবাজী ও কূটকৌশলের হাতিয়ার নিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধে সৃষ্টি করে। পরিণামে তারা নিজেরাতো গোমরাহ থাকেই সমাজের মধ্যে গোমরাহীর এক স্থায়ী উৎসে পরিণত হয় এবং সাধারণ জনগণকে চরমভাবে গোমরাহ করে। আফসোস যদিও এব্যাপারে বহুপূর্বেই কুরআন মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আল্ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় তৎকালীন ইহুদী খৃষ্টান আলেমরা যে ভূমিকায় ছিল আমাদের মুসলিম সমাজেও আজ অনেক আলেম ও পীর একই ভূমিকা অবলম্বন করছে।

মূলতঃ এই ভূমিকার অন্যতম কারণ অর্থের লোভ-লালসা। তাই আয়াতের পরবর্তী অংশে এই লোভ লালসা দুর করার জন্য অর্থ লিপ্সার করুণ পরিণতি ও কঠোর সাজা এবং ব্যাধি থেকে পরিত্রাণের উপায় বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য বলা হয়েছে সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার জন্য। হাদীস শরীফে রাসূল করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন "যে মালের যাকাত দেয়া হয় তা জমা রাখা সঞ্চিত ধনরত্নের শামিল নয়।" (আবু দাউদ, আহমদ) এ থেকে বুঝা যায় যে, যাকাত আদায়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে তা জমা রাখা গুনাহ নয়।

অতএব আমাদের উচিত কোন ভন্ড বা প্রতারক আলেমের কথায় কর্ণপাত না করে সত্যিকার আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া এবং কুরআন ওহাদীসের সাথে

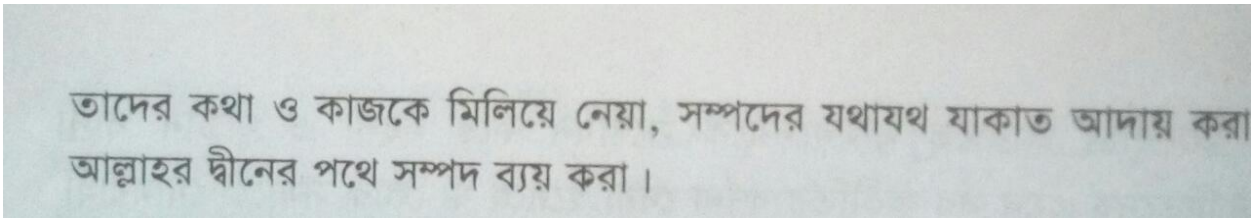

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানের আলিমদের প্রকৃত অবস্থান জানতে পারলাম।

২. একশ্রেণির আলিম, পীর ও ফকির বাবা রয়েছে যারা ধর্মের নামে পেটপূজারী।

৩. নিসাব পরিমাণ সম্পদ হলে যাকাত আদায় না করলে কী ভয়াবহ শাস্তি দেয়া হবে তা জানতে পারলাম।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا أَمَٰنَٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

হে মু'মিনগণ! তোমরা জেনে বুঝে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করো না, আর যে বিষয়ে তোমরা আমানাত প্রাপ্ত হয়েছ তাতেও বিশ্বাস ভঙ্গ করো না।

২৭ নং আয়াতের তাফসীর:

আল্লাহর আমানত বলতে অধিকাংশের মতে যাবতীয় ফরয কাজ বুঝানো হয়েছে। আর রাসূলের আমানত বলতে তার সুন্নাত ও নির্দেশ বুঝানো হয়েছে। সে হিসাবে খেয়ানত হলো সেগুলো না মানা। [ফাতহুল কাদীর]

নিজেদের আমানত বলতে সে সব দায়িত্ব বুঝানো হয়েছে, যা কারো প্রতি আস্থা স্থাপন করে তার উপর ন্যস্ত করা হয়। তা ওয়াদা পূরনের দায়িত্ব হতে পারে, সামগ্রিক সামাজিক চুক্তি হতে পারে, কোন সংস্থার আভ্যন্তরীণ গোপন তথ্য হতে পারে, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ধন-সম্পদ হতে পারে। কারো প্রতি বিশ্বাস করে জনসমাজ যদি তাকে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করে তবে তাও এর মধ্যে শামিল মনে করতে হবে।

আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে, প্রথম অর্থ যা উপরে করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং তোমাদের আমানতসমূহেরও খেয়ানত করো না। [তাবারী; ইবন কাসীর] দ্বিতীয় অর্থ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না কারণ এতে করে তোমরা তোমাদের উপর অর্পিত আমানতেরই খেয়ানত করে বসবে। [তাবারী; বাগভী]

এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু কোন বর্ণনাই ত্র“টি থেকে মুক্ত নয়; তাই এগুলো উল্লেখ ক রা হল না।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম সহীহাইনে খিয়ানত সম্পর্কে হাতিব বিন আবূ বালতা'আহ (রাঃ)-এর একটি ঘটনা নিয়ে এসেছেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি কুরাইশদের নিকট একটি চিঠি লিখলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাদের প্রতি হামলা করার মনস্থ করেছেন। এ বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জানিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পিছনে লোক পাঠিয়ে চিঠি নিয়ে আসলেন। হাতিবকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাজির করলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এসব কাজ করেছেন বলে স্বীকার করেন।

উমার (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি কি তার গর্দান উড়িয়ে দেব। কেননা সে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের সাথে খিয়ানত করেছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন: তাকে ছেড়ে দাও, সে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম। (সহীহ বুখারী হা: ৩৯৮৩)

ইমাম ইবনু কাসীর (রাঃ) বলেন: সঠিক কথা হল আয়াতটি ব্যাপক, সকল খিয়ানতকারীর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে খিয়ানত করার অর্থ হল: আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যা নির্দেশ দিয়েছেন তা বর্জন করা আর যা নিষেধ করেছেন তাতে লিপ্ত হওয়া। (তাফসীর মুয়াসসার, পৃঃ ১৮০)

(وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ)

'তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও বিশ্বাস ভঙ্গ করে না' ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: আমানত হল সেসব আমল যা আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে করতে বলেছেন। (ইবনু কাসীর, ৪র্থ খ. পৃঃ ৪৫)

(وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ)

'সন্তান-সন্ততি এক পরীক্ষাস্বরূপ' অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করবেন। সন্তান দিয়েছেন এটা জানার জন্য কে তাঁর শুকরিয়া আদায় করে, আর কে তাঁকে ভুলে দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ط وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ أَجْرٌ عَظِيْمٌ)

“নিশ্চয়ই তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা, আর আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহা প্রতিদান।” (সূরা তাগাবুন ৬৪:১৫)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ)

“হে মু’মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন না করে; যারা এমন করবে (উদাসীন হবে) তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা মুনাফিকুন ৬৩:৯)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

(يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ)

“হে মু’মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক হও।” (সূরা তাগাবুন ৬৪:১৪)

وَأَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ أَجْرٌ عَظِيْمٌ

‘আল্লাহরই নিকট মহাপুরস্কার রয়েছে।’ অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার নিকট যে সাওয়াব ও জান্নাত রয়েছে তা এই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হতে বহুগুণে উত্তম। এগুলো কখনও কখনও শত্রুদের মত ক্ষতির কারণও বটে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের জন্য অকল্যাণকর। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন: ঐ স্বত্বার শপথ যার হতে আমার প্রাণ, ততক্ষণ তোমাদের কেউ মু’মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তার পিতা-মাতা, সন্তান ও সমস্ত মানুষ থেকে আমি অধিক প্রিয় হব। (সহীহ বুখারী হা: ১৪)

সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ ভঙ্গ করা ও নিষেধাজ্ঞায় লিপ্ত হওয়া তাদের সাথে খিয়ানত করার শামিল। তাই একজন মু'মিন সর্বদা সতর্ক থাকবে তার দ্বারা যেন কোন প্রকার খিয়ানত না হয়। কারণ খিয়ানত করা ঈমানের লক্ষণ নয় বরং তা মুনাফিকের লক্ষণ।

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অধিকারে খিয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা) এই যে, জনসমাজে আল্লাহর ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করা তথা নির্জনে তার বিপরীত পাপে লিপ্ত হওয়া। অনুরূপভাবে এটিও খিয়ানত যে, ফারায়েযের মধ্যে কোন ফরয ছেড়ে দেওয়া ও নিষিদ্ধ জিনিষের মধ্যে কোন কিছু করা। পরস্পরের আমানতে খিয়ানত করতেও নিষেধ করা হয়েছে। নবী (সাঃ)ও আমানত রক্ষার ব্যাপারে খুব বেশি তাকীদ করেছেন। হাদীসে এসেছে যে, নবী (সাঃ) প্রায় খুতবায় এ কথাটি অবশ্যই বলতেন, "যে আমানত রক্ষা করে না তার ঈমান নেই, যে চুক্তি রক্ষা করে না, তার দ্বীন নেই।" (আহমাদ)

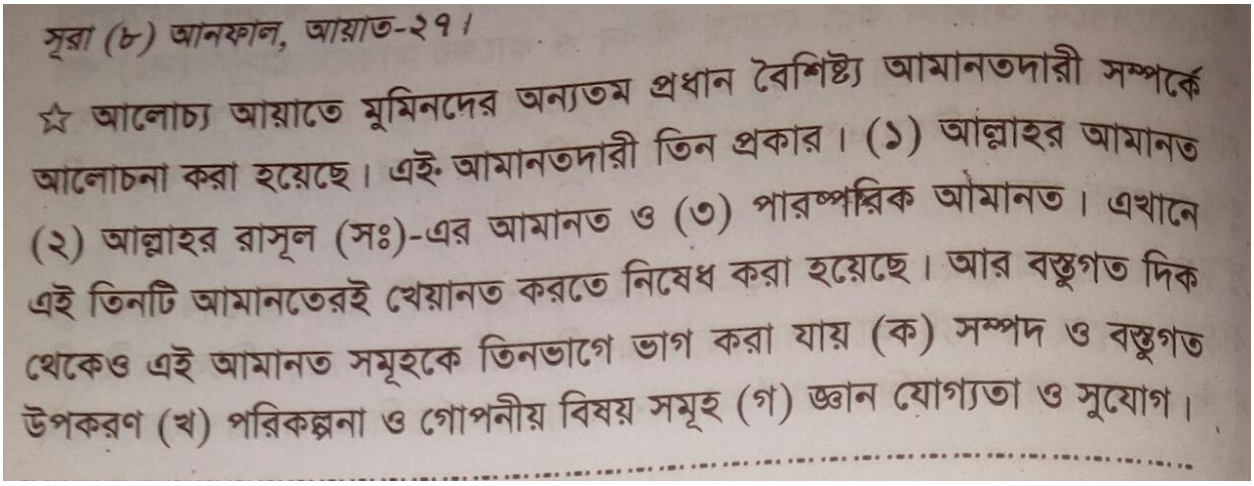

সূরা (৮) আনফাল, আয়াত-২৭।

☆ আলোচ্য আয়াতে মুমিনদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য আমানতদারী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই আমানতদারী তিন প্রকার। (১) আল্লাহর আমানত (২) আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর আমানত ও (৩) পারস্পরিক আমানত। এখানে এই তিনটি আমানতেরই খেয়ানত করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর বস্তুগত দিক থেকেও এই আমানত সমূহকে তিনভাগে ভাগ করা যায় (ক) সম্পদ ও বস্তুগত উপকরণ (খ) পরিকল্পনা ও গোপনীয় বিষয় সমূহ (গ) জ্ঞান যোগ্যতা ও সুযোগ।

মানুষ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর আমানতগুলো বিভিন্নভাবে খেয়ানত করে- সম্পদের অপব্যবহার, পরিকল্পনা ও গোপনীয়তা নষ্ট করে এবং নিজের যোগ্যতা জ্ঞান ও সামর্থকে যথাযথ কাজে না লাগিয়ে বিশেষত যখন মুসলিম সমাজ বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্র ও আক্রমনের শিকার তখন এই সমস্ত আমানত যথাযথ রক্ষনাবেক্ষণ ও ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে। আর আমাদের পারস্পরিক আমানত সমূহ প্রতিদিনই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। আমরা কি এটা দাবী করতে পারি যে পারস্পরিক আমানত সমূহ খেয়ানত হচ্ছে না? আল্লাহর কাছে আমরা এগুলোর কি জবাব দেবো?

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. যে কোন প্রকার খিয়ানত করা হারাম। তবে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে খিয়ানত করা অধিক খারাপ।

২. আল্লাহ তা'আলা সম্পদ ও সন্তান দ্বারা পরীক্ষা করেন।

সুরা: আন-নিসা

আয়াত নং :-৫৮

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا

হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানত তার হকদারদের হাতে ফেরত দেবার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর লোকদের মধ্যে ফায়সালা করার সময় "আদল" ও ন্যায়নীতি সহকারে ফায়সালা করো। আল্লাহ্ তোমাদের বড়ই উৎকৃষ্ট উপদেশ দান করেন। আর অবশ্যই আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন।

৫৮ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াতটি নাযিল হওয়ার একটি বিশেষ ঘটনা রয়েছে। তা হল এই যে, ইসলাম-পূর্বকালেও কা'বা ঘরের সেবা করাকে এক বিশেষ মর্যাদার কাজ মনে করা হত। কাবার কোন বিশেষ খেদমতের জন্য যারা নির্বাচিত হত, তারা গোটা সমাজ তথা জাতির মাঝে সম্মানিত ও বিশিষ্ট বলে পরিগণিত হত। সে জন্যই বায়তুল্লাহ্‌র বিশেষ খেদমত বিভিন্ন লোকের মাঝে ভাগ করে দেয়া হত। জাহেলিয়াত আমল থেকেই হজের মওসুমে হাজীদেরকে যমযম কূপের পানি পান করানোর সেবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উপর ন্যস্ত ছিল। একে বলা হত 'সিকায়া'। অনুরূপই কা'বা ঘরের চাবি নিজের কাছে রাখা এবং নির্ধারিত সময়ে তা খুলে দেয়া ও বন্ধ করার ভার ছিল উসমান ইবন তালহার উপর। এ ব্যাপারে স্বয়ং উসমান ইবন তালহার ভাষ্য হল এই যে, জাহেলিয়াত আমলে আমরা সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন বায়তুল্লাহর দরজা খুলে দিতাম এবং মানুষ তাতে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করত। হিজরতের পূর্বে একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় সাহাবীসহ বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে গেলে উসমান (যিনি তখনো পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি) তাকে ভিতরে প্রবেশ করতে বাঁধা দিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ধৈর্য ও গাম্ভীর্য সহকারে উসমানের কটুক্তিসমূহ সহ্য করে নিলেন। অতঃপর বললেন, হে উসমান হয়ত তুমি এক সময় বায়তুল্লাহর এই চাবি আমার হাতেই দেখতে পাবে। তখন যাকে ইচ্ছা এই চাবি অর্পণ করার অধিকার আমারই থাকবে। উসমান ইবন তালহা বলল, তাই যদি হয়, তবে সেদিন কুরাইশরা অপমানিত অপদস্থ হয়ে পড়বে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, তা নয়। তখন কুরাইশরা আযাদ হবে, তারা হবে যথার্থ সম্মানে সম্মানিত। এ কথা বলতে বলতে তিনি বায়তুল্লাহর ভিতরে প্রবেশ করলেন। (উসমান বললেন) তারপর আমি যখন আমার মনের ভিতর অনুসন্ধান করলাম, তখন আমার যেন নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তিনি যা কিছু বললেন, তা অবশ্যই ঘটবে। সে মুহূর্তেই আমি মুসলিম হয়ে যাওয়ার সংকল্প নিয়ে নিলাম। কিন্তু আমি আমার সম্প্রদায়ের মতিগতি পরিবর্তিত দেখতে পেলাম। তারা আমাকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করতে লাগল। কাজেই আমি আর আমার (মুসলিম হওয়ার) সংকল্প বাস্তবায়িত করতে পারলাম না। অতঃপর মক্কা বিজিত হয়ে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে বায়তুল্লাহর চাবি চাইলেন। আমি তা পেশ করে দিলাম। তখন তিনি পুনরায় আমার হাতেই সে চাবি ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেনঃ এই নাও, এখন থেকে এ চাবি কেয়ামত পর্যন্ত তোমার বংশধরদের হাতেই থাকবে। অন্য যে কেউ তোমাদের হাত থেকে ফিরিয়ে নিতে চাইবে, সে হবে যালেম, অত্যাচারী। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের হাত থেকে এ চাবি ফিরিয়ে নেবার কোন অধিকার কারোরই থাকবে না। [দেখুন- তাবরানীঃ ১১/১২০]

আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, যার দায়িত্বে কোন আমানত থাকবে, সে আমানত প্রাপককে পৌছে দেয়া তার একান্ত কর্তব্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমানত প্রত্যর্পণ ব্যাপারে বিশেষ তাকীদ প্রদান করেছেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এমন খুব কম হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ভাষণ দিয়েছেন অথচ তাতে একথা বলেননি –'যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার মধ্যে ঈমান নেই। আর যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিয়মানুবর্তিতা নেই, তার দ্বীন নেই'। [মুসনাদে আহমাদ ৩/১৩৫]

তাছাড়া আমানতদারী না থাকা মুনাফেকীর একটি আলামত। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মুনাফেকীর লক্ষণসমূহ বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি লক্ষণ এটাও বলেছিলেন যে, যখন তার কাছে কোন আমানত রাখা হয় তখন সে তাতে খেয়ানত করে। [বুখারী: ৩৩; মুসলিম: ৫৯]

[২] এখানে লক্ষণীয় যে, কুরআনুল কারীম আমানতের বিষয়টিকে (امانات) বহুবচনে উল্লেখ করেছে। এতে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, কারো নিকট অপর কারো কোন বস্তু বা সম্পদ গচ্ছিত রাখাটাই শুধুমাত্র ‘আমানত’ নয়, যাকে সাধারণতঃ আমানত বলে অভিহিত করা হয় এবং মনে করা হয়; বরং আমানতের আরো কিছু প্রকারভেদ রয়েছে। আয়াতের শানে-নুযূল প্রসঙ্গে উপরে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, তাও কোন বস্তুগত আমানত ছিল না। কারণ, বায়তুল্লাহর চাবি বিশেষ কোন বস্তু নয়, বরং তা ছিল বায়তুল্লাহর খেদমতের একটা পদের নিদর্শন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রীয় যত পদ ও পদমর্যাদা রয়েছে, সেসবই আল্লাহ তা’আলার আমানত। যাদের হাতে নিয়োগ-বরখাস্তের অধিকার রয়েছে সে সমস্ত কর্মকর্তা ও অফিসারবৃন্দ হলেন সে পদের আমানতদার। কাজেই তাদের পক্ষে কোন পদ এমন কাউকে অর্পণ করা জায়েয নয়, যে লোক তার যোগ্য নয়, বরং প্রতিটি পদের জন্য নিজের ক্ষমতা ও সাধ্যানুযায়ী যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান করা কর্তব্য। যোগ্যতা ও পরিপূর্ণ শর্ত মোতাবেক কোন লোক পাওয়া না গেলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে যোগ্যতা ও আমানতদারী তথা সততার দিক দিয়ে যে সবচেয়ে অগ্রবর্তী হবে, তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমানতের গুরুত্ব লক্ষ্য করে এক বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ সমস্ত গোনাহের কাফফারা হলেও আমানতের কাফফারা হয় না। জিহাদে শহীদ ব্যক্তিকে সেদিন হাজির করে বলা হবে, আমানত আদায় কর, সে বলবে, কোত্থেকে তা আদায় করব? দুনিয়া তো শেষ হয়ে গেছে। তখন তাকে হাবীয়া জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। সে সেখানে গেলে আমানতকে যেদিন ত্যাগ করেছিল সেদিনের রূপে দেখতে পাবে। সে তখন তা ধরে কাধে নিয়ে আসতে চাইবে, যখনি সেখান থেকে সে বের হতে যাবে, তখন আমানত পালিয়ে যাবে, আর এভাবে সে আমানতের পিছনে সবসময় ছুটতে থাকবে। তারপর আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উপরোক্ত আয়াত পাঠ করলেন। আল-মাতালিবুল আলীয়া, হিলইয়াতুল আউলিয়া, মাকারিমুল আখলাক এ আমানতের পরিচয় সম্পর্কে আবুল আলীয়া বলেন, যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যা নিষেধ করা হয়েছে তা সবই আমানত। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

[৩] এ আয়াতে ইসলামের কয়েকটি মৌলিক নীতির আলোচনাও এসে গেছে । প্রথমতঃ প্রকৃত হুকুম ও নির্দেশ দানের মালিক আল্লাহ তা’আলা। পৃথিবীর শাসকবর্গ তাঁর আজ্ঞাবহ। এতে প্রতীয়মান হয় যে, শাসনক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের মালিকও একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলাই। দ্বিতীয়তঃ সরকারী পদসমূহ অধিবাসীদের অধিকার নয়, যা জনসংখ্যার হারে বন্টন করা যেতে পারে; বরং এগুলো হল আল্লাহ প্রদত্ত আমানত, যা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট দায়িত্বের পক্ষে যোগ্য ও যথার্থ লোককেই দেয়া যেতে পারে। তৃতীয়তঃ পৃথিবীতে মানুষের যে শাসন, তা শুধুমাত্র একজন প্রতিনিধি ও আমানতদার হিসেবেই হতে পারে। তারা দেশের আইন প্রণয়নে সে সমস্ত নীতিমালার অনুসরণে বাধ্য থাকবে যা একক ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ তা’আলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বাতলে দেয়া হয়েছে। চতুর্থতঃ তাদের নিকট যখন কোন মোকদ্দমা আসবে, তখন বংশ, গোত্র, বর্ণ, ভাষা এমনকি দ্বীন ও মতবাদের পার্থক্য না করে সঠিক ও ন্যায়সংগত মীমাংসা করে দেয়া শাসন কর্তৃপক্ষের উপর ফরয। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, শাসনকর্তৃপক্ষের উপর ওয়াজিব হলো, আল্লাহর আইন অনুসারে বিচার করা, আমানত আদায় করা। যদি তারা সেটা করে তবে জনগনের উপর কর্তব্য হবে তার কথা শোনা, আনুগত্য করা, তার আহবানে সাড়া দেয়া। [তাবারী]

[৪] এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তোমাদিগকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা খুবই উত্তম। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা সবার ফরিয়াদই শোনেন এবং যে লোক বলার কিংবা ফরিয়াদ করার সামর্থ্য রাখে না, তিনি তার অবস্থাও উত্তমভাবে দেখেন। অতএব তার রচিত নীতিমালাই সর্বদা সকল রাষ্ট্রের জন্য সর্বযুগে উপযোগী হতে পারে। পক্ষান্তরে মানব রচিত নীতিমালা শুধুমাত্র নিজেদের পরিবেশেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেগুলোরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

[৫] এ আয়াতের তাফসীর ইমাম আবু দাউদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি তার কানের উপর রাখলেন এবং পরবর্তী আঙ্গুলটি রাখলেন তার চোখের উপর। অর্থাৎ আল্লাহর চোখ ও কান রয়েছে। [আবু দাউদ: ৪৭২৮]

অধিকাংশ মুফাসসিরে কিরামের মতে, এ আয়াত উসমান বিন তালহা (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তিনি বংশগতভাবেই কাবা শরীফের তত্বাবধায়ক এবং তার চাবির রক্ষক ছিলেন। তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাবাতে উপস্থিত হয়ে তাওয়াফসহ অন্যান্য কাজ শেষ করে উসমান বিন তালহাকে ডেকে পাঠালেন। তারপর তাঁর হাতে কাবার চাবি হস্তান্তর করে দিয়ে বলেন, এগুলো তোমার চাবি। আজকের দিন অঙ্গীকার পূরণের দিন। (ইবনে কাসীর, ২/৩৭৯)

এ আয়াত বিশেষ কারণে অবতীর্ণ হলেও তা সকল প্রকার আমানতকে শামিল করে। নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

যে তোমার কাছে আমানত রেখেছে তার কাছে আমানত ফিরিয়ে দাও। আর যে খিয়ানত করেছে তার সাথে খিয়ানত কর না। (আবূ দাঊদ হা: ৩৫৩৪, তিরমিযী হা: ১২৬৪, সহীহ)

তারপর আল্লাহ তা'আলা সকল শ্রেণির মানুষকে সম্বোধন করে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচারকার্য সম্পন্ন করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ وَكَلَهُ إِلَي نَفْسِهِ

বিচারক যতক্ষণ পর্যন্ত জুলুম করে না ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তার সাথে থাকেন। অতঃপর সে যখন জুলুম শুরু করে দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে তার নিজের ওপর ছেড়ে দেন। (ইবনু মাযাহ হা: ২৩২১, হাসান)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন: কিয়ামতের দিন ন্যায়-বিচারকারীরা দয়াময় আল্লাহ তা'আলার ডান পাশে নূরের মিম্বারের ওপর থাকবে। আল্লাহ তা'আলার উভয় হাত ডান হাত, যারা বিচারে, পরিবারে এবং যাদের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে (তারা সবাই এতে শামিল)। (সহীহ মুসলিম হা: ১৮২৭)

তাই আমানত ফিরিয়ে দেয়া, ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার বজায় রাখা প্রতিটি মু'মিন মুসলিমের নৈতিক দায়িত্ব।

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলরা যেসব খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে গেছে তোমরা সেগুলো থেকে দূরে থেকো। বনী ইসরাঈলদের একটি মৌলিক দোষ ছিল এই যে, তারা নিজেদের পতনের যুগে আমানতসমূহ অর্থাৎ দায়িত্বপূর্ণ পদ, ধর্মীয় নেতৃত্ব ও জাতীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মর্যাদপূর্ণ পদসমূহ (Positions of trust) এমন সব লোকদেরকে দেয়া শুরু করেছিল যারা ছিল অযোগ্য, সংকীর্ণমনা, দুশ্চরিত্র, দুর্নীতিপরায়ণ, খেয়ানতকারী ও ব্যভিচারী। ফলে অসৎ লোকদের নেতৃত্বে সমগ্র জাতি অনাচারে লিপ্ত হয়ে গেছে। মুসলমানদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে, তোমরা এই বনী ইসরাঈরদের মতো আচরণ করো না। বরং তোমরা যোগ্য লোকদেরকে আমানত সোপর্দ করো। অর্থাৎ আমানতের বোঝা বহন করার ক্ষমতা যাদের আছে কেবল তাদের হাতে আমানত তুলে দিয়ো। বনী ইসরাঈলদের দ্বিতীয় বড় দুর্বলতা এই ছিল যে, তাদের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির প্রাণশক্তি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থে তারা নির্দ্বিধায় ঈমান বিরোধী কাজ করে চলতো। সত্যকে জেনেও সুস্পষ্ট হঠ ধর্মীতায় লিপ্ত হতো। ইনসাফের গলায় ছুরি চালাতে কখনো একটুও কুন্ঠা বোধ করতো না। সে যুগের মুসলমানরা তাদের বে-ইনসাফীর তিক্ত অভিজ্ঞতা হাতে কলমে লাভ করে চলছিল। একদিকে তাদের সামনে ছিল মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর ওপর যারা ঈমান এনেছিল তাদের পুত পবিত্র জীবনধারা। অন্যদিকে ছিল এমন এক জনগোষ্ঠীর জীবন যারা মূর্তিপূজা করে চলছিল। তারা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতো। বিমাতাদেরকেও বিয়ে করতো। উলংগ অবস্থায় কাবা ঘরের চারদিকে তওয়াফ করতো। এই তথাকথিত আহলি কিতাবরা এদের মধ্যে থেকে প্রথম দলটির ওপর দ্বিতীয় দলটিকে প্রাধান্য দিতো। তারা একথা বলতে একটুও লজ্জা অনুভব করতো না যে, প্রথম দলটির তুলনায় দ্বিতীয় দলটি অধিকতর সঠিক পথে চলছে। মহান আল্লাহ তাদের এই বে-ইনসাফির বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পর এবার মুসলমানদের উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা

ওদের মতো অবিচারক হয়ো না। কারো সাথে বন্ধুতা বা শত্রুতা যাই হোক না কেন সব অবস্থায় ইনসাফ ও ন্যায়নীতির কথা বলবে এবং ইনসাফ ও সুবিচার সহকারে ফয়সালা করবে।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. আমানত রক্ষা করা ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য।

২. বিচার-ফায়সালায় ন্যায় পন্থা অবলম্বন করা ওয়াজিব।

৩. আল্লাহ তা'আলার হাত রয়েছে, এমনকি তার উভয় হাত ডান হাত।